শতাব্দীর চিঠি

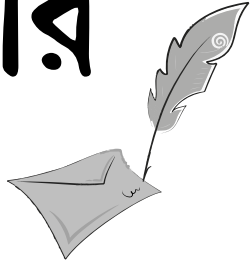

বাংলায় মুসলিম সভ্যতার বিকাশ, গণেশচক্রের চ্যালেঞ্জ ও
দরবেশ নুর কুতুবুল আলমের লড়াই

মুসা আল হাফিজ

মাকতাবাতুল আসলাফ

নতুন সংস্করণে দু'টি কথা

'শতাব্দীর চিঠি' মাকতুবাত সাহিত্যের বিবর্তিত রূহানি অনুশীলন। একটি হৃদয় এখানে বহু শতকের ওপার থেকে চিঠি লিখেছে আরেকটি হৃদয়কে। এই চিঠিতে সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভাষা-সাহিত্য বিগলিত হয়ে মিশেছে রাজনীতির মোহনায়। মনুবাদের যে হুমকি আজ বাস্তব সঙ্কট হয়ে চোখ রাঙাচ্ছে, সে অতীতে কেমন করে আমাদের যা কিছু , তাকে দাফন করতে চেয়েছে, এর ইতিবৃত্ত দেখা যাবে এই পত্রের দর্পণে। বিপরীতে এই ভূমিতে, এই সমাজ ও সংস্কৃতির মর্মমূলে অবস্থান করে কীভাবে জাতিগত ও সাংস্কৃতিক সুরক্ষা ও ঘুরে দাঁড়াবার লড়াই চলবে, এর রূপরেখাও পাওয়া যায় মহান মুজাদ্দিদ নুর কুতুবুল আলমের সংগ্রামে, সাধনায়। এই অতীতকে এখানে বয়ান করা হয়েছে মূলত আমাদের বর্তমানকে বয়ান করা ও পথ দেখানোর জন্য। যদি আমরা দেখতে চাই।

বইটি রচিত হয় ২০১১-১২ সালের বিশেষ প্রেক্ষাপটে। পরিস্থিতির ফেনায়িত ঢেউ বইটির বিষয়বস্তুকে আমন্ত্রণ করছিলো। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালে। পাঠক মহলে ব্যাপক মমতা লাভ করে বইটি এবং কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

দীর্ঘদিন বাজারে অনুপস্থিত থাকার পর বইটি নতুন করে প্রকাশিত হচ্ছে আসলাফ থেকে। এতে অল্প কিছু তথ্য বর্ধিত হয়েছে। আশা করি শতাব্দীর চিঠির আসলাফ সংস্করণও পাঠকদের সমাদর পাবে।

মুসা আল হাফিজ
বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

এক

আপনার সেই চিঠির কথা মনে পড়ছে। বহু শতকের দূরত্ব থেকে আমার হৃদয়কে পাঠিয়ে দিয়েছি আপনার সেই পত্রের পাশে। মুক্তিকামনা আর ব্যথা, হাহাকার আর আগুন, প্রত্যাশা আর ভীতি, প্রত্যয় আর প্রার্থনা ছিলো আপনার প্রতিটি হরফে। যে রাতে চিঠি লেখেন, আকাশে লক্ষ-কোটি তারা চমকে উঠেছিলো? শিউরে উঠেছিলো বাতাসের হৃদয়? থেমে গিয়েছিলো সময়ের শ্বাস-প্রশ্বাস?

আপনার একটি চিঠি ইতিহাসের গতি দিয়েছিলো বদলে। এই আকাশের দিকে উত্থিত মিনার, এই মাথায় সফেদ টুপি দিয়ে রাস্তায় নেমে আসা ভোর, এই কাদামাখা পথ দিয়ে এগিয়ে চলা মক্তবের মেয়ে কিংবা এই স্বাধীন পদ্মার ঢেউ, যমুনার মুক্ত চর–সকলেই স্বকীয় অস্তিত্বের প্রয়োজনে তাকিয়েছিলো আপনার কলমের দিকে। কী লিখছে কলম!

কী লিখেছিলো কলম সেই রাতে? পাণ্ডুয়ার সেই জ্যোৎস্নাজ্বলা রাতে–যখন বাংলার ভাগ্য রচনা করছিলো রাজা গণেশ নারায়ণের ভয়াল ত্রিশূল।

আপনি, নুর কুতুবুল আলম, কোন সাহস আর শক্তিতে হয়ে উঠেছিলেন বাংলার শেষ আশ্রয়? আপনার তো বিত্ত বলতে কিছুই ছিলো না। ছিলো না কোনো লশকর-সেনাবাহিনী। ছিলো না কোনো রাজকীয় প্রস্তুতি। কিন্তু আপনি প্রতিবাদী হলেন। প্রবল পরাক্রান্ত দখলদারের বিরুদ্ধে হয়ে উঠলেন প্রতিরোধ। তুফানের বিপরীতে এমন নিঃসঙ্গ লড়াই বার বার দেখেনি ইতিহাস। আপনি দাঁড়িয়েছিলেন ইতিহাসের একটি ধারায়, চাইছিলেন বাংলা ও বাঙালির মানবপ্রেমের ঐতিহ্য আর তাওহিদি জীবনসত্যের সংরক্ষণ, রাজা গনেশ হাঁটছিলেন বিপরীত আরেক ধারায়, চাইছিলেন মুসলিমবিহীন বাংলা। সাম্প্রদায়িক নির্মমতার হাত দিয়ে লিখছিলেন রক্ত ও বিনাশের দাস্তান ।

রাজা চাইছিলেন বাংলার ইতিহাসকে নিয়ে যাবেন পেছনের দিকে। আর্যদের দুঃশাসনের রাত ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি। ফিরিয়ে এনেছিলেন বৈদিক সংস্কৃতি। আর্যশাসন এনেছিলো মানুষের দুর্গতি। জাতপাতের বর্ণবাদ আর শ্রেণীগত বৈষম্য। রক্তসূত্রে ব্রাহ্মণশ্রেণী হয়ে ওঠে সবধরনের সুবিধাভোগী। শাসকরা মানুষের জায়গায় থাকে না, হয়ে ওঠে মানুষের দেবতা।

একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১২০৩ সাল অবধি সেন শাসনে ছিলো এই দেশ। সেন রাজাদের পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন ভারতের দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে। তাঁরা এ দেশে সৃষ্টি করেন হিংস্রতার রাজত্ব। বহু আগে, ৬৩৭ সালে গুপ্তবংশীয় রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে এ দেশে সূচিত হয়েছিলো এক ভয়াবহ অরাজকতা। ১১৩ বছর ধরে যা ছিলো অব্যাহত। এই অরাজকতার শাসনকে বলা হতো মাৎসান্যায়, বোয়াল মাছের রাজত্ব। ৭৫০ সালে তা হয় অবসিত। সেন রাজারা সেই অরাজকতাকে ফিরিয়ে আনেন আবারও। বোয়াল মাছের শাসন মানেই 'জোর যার মুল্লুক তার'। নিয়ম নেই, বিচার নেই। যার দাঁত যত ধারালো, চোয়াল যত মজবুত, গায়ে যত বল, প্রভুত্ব তার, রাজত্ব তার। সে যা ইচ্ছে তাই করবে। যাকে ইচ্ছে তাকে ধরবে, মারবে, টুকরো টুকরো করে ফেলবে। খাবে। এমনই চলছিলো চারদিকে। বৈদিক সংস্কৃতি ও সেন রাজত্বে এই দেশ, এই জনপদ বোয়াল মাছের চোয়ালে কাতরাচ্ছিলো।

নিম্নশ্রেণীর কোটি কোটি মানুষ বাধ্য হয় হীনতর ও হেয়তর জীবন যাপনে। সবচেয়ে বেশি বিপদ আসে বাংলাভাষীদের ওপর। বৈদিক সেনরা এই সব জনপদকে শাসন করেছে, কিন্তু ভালোবাসেনি। কারণ, এ দেশের কোনোই সম্মান ছিলো না মনুসংহিতায়। সেখানে বরং আছে 'তীর্থযাত্রা ছাড়া এ দেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।' ব্রাহ্মণ্যবাদী ঋষিরা এই জনপদের সন্তানদের মানুষ বলতে অপারগ ছিলো। তারা তাদের বলতো দাস, দস্যু, সর্প। বলতো অসুর, পিশাচ, পক্ষীজাত। ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে দেবতার ভাষায় তাদেরকে দেবতার শত্রু বলে অভিহিত করতো। বলতো, ওরা হলো রাক্ষস, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি। তাদের রক্ত ঝরানোতে ছিলো গৌরব। তাদের উচ্ছেদ ও অপমানে ছিলো দেবতার তুষ্টি। তাদের হত্যা ও নির্মূল ছিলো ধর্মাচারের মতো। এ ভূমির সন্তানরা ভয়ে ভয়ে থাকতো, লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতো।

কিন্তু লুকিয়ে থাকা সহজ ছিলো না। কারণ তারা কথা বলতো বাংলায়।

আর বাংলাকে ঘৃণা করতো আর্যরা। সেনদের রাজভাষা ছিলো সংস্কৃত। বাংলার চর্চা ছিলো নিষিদ্ধ। বাংলাভাষীদের আশীর্বাদগ্রহণকেও শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ করা হয়। তাচ্ছিল্য করে বলা হয়–

'আশীর্বাদং ন গৃহীয়াৎ পূর্ববঙ্গ নিবাসিনঃ
শতায়ুরিতি বক্তব্যে হতায়ুর্বদতি যতঃ'

অর্থ হচ্ছে, পূর্ববঙ্গের লোকদের আশীর্বাদ গ্রহণ করো না। কারণ তারা শতায়ু বলতে গিয়ে হতায়ু বলে বসে। ঐতরেয় আরণ্যকে বাংলা ভাষাকে ইতর ভাষা হিসেবে দেখানো হয়। পাখির ভাষার মতো দুর্বোধ্য বলে একে আখ্যা দেয়া হয়। আর্যদের দৃষ্টিতে বাংলা ভাষা অন্ত্যজ ছিলো বলেই শূদ্রদের জন্য বরাদ্ধ করা হয় এ ভাষার পাঁচালি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুরাণ পাঠের অধিকার তাদের নেই। প্রচার করা হতো শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞা–

'পুরাণ পড়িতে নাই শুদ্রের অধিকার
পাঁচালি পড়িয়া তব এ ভব সংসার'

বাংলা ভাষা তাদের চোখে এতই হেয় ছিলো যে, এ ভাষায় আঠারোটি পুরাণ কিংবা রামের জীবনী পাঠ করলে, শুনলে নিশ্চিত হতো নরক। বাংলাভাষীদের জন্য বরাদ্ধ নরকের নাম ছিলো রৌরব। চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে আছে এর ভাষ্য–

'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ'

অর্থাৎ আঠারোটি পুরাণ আর রামের জীবনচরিত দেশীয় ভাষায় শুনলে রৌরব নামক নরকে যেতে হবে। নরকে শাস্তির জন্য বাঙালিদের রৌরবে যাওয়া লাগতো না। এ দেশই তাদের জন্য হয়ে উঠেছিলো নরক।

রাজসভায় আদর পেতেন সংস্কৃতের পণ্ডিত ও কবিরা। এ দেশে প্রধান পণ্ডিত তখন হলায়ূধ। লক্ষণ সেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী ছিলেন পুরোষতম, পশুপতি, ঈষাণ প্রমুখ। তাঁরা বাংলাকে করতেন ঘৃণা, এর বিরুদ্ধে দেখাতেন পাণ্ডিত্য। এ দেশে প্রধান কবি তখন ধোয়া, শরণ, গোবর্ধন, উমাপতি প্রমুখ। তাঁরা বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতেন না। লিখতেন সংস্কৃতে। কবিতার ছত্রে ছত্রে থাকতো বাংলার প্রতি বিদ্বেষ

ও তাচ্ছিল্য। হিন্দু গণস্তরে এর প্রভাব পড়ে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ছড়িয়ে পড়ে তৃণমূলে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন, আর্যদের পদানত এই ভূখণ্ডের তৎকালীন অধিবাসীরা তাদের মুখের ভাষা ভুলে যেতে বাধ্য হয়।

বাংলার সেরা সন্তানরা এ দেশে থাকতে পারতেন না। তাঁরা ছিলেন বৌদ্ধ, কথা বলতেন বাংলায়। তাঁদের পালাতে হতো। প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা যেতেন বার্মায়, তিব্বতে, নেপালে। নির্বাসিত হয়েও তারা রক্ষা করতেন এ মাটির সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য। এরই ফলে নেপালে পাওয়া সম্ভব হয়েছে বাংলা সাহিত্যের আদিনিদর্শন। চর্যাপদ। এ দেশে যত নিদর্শন থাকার কথা, কোনো কিছুই থাকেনি। থাকতে দেয়া হয়নি। বাংলা ভাষায় লিখলে হাত নিরাপদ ছিলো না। বললে নিরাপদ ছিলো না জিহ্বা। আর্যদের হাতে বাংলা ভাষা ও বঙ্গীয় জীবনে নেমে এলো মৃত্যুদশা। অনেক আগ থেকেই বাংলার আর্তনাদ উচ্চারিত হচ্ছিলো লুইপাদের মতো কবিদের কণ্ঠে–'দুখেতে নিচিত মরি সই।' আর তখনই...

তখনই প্রতাপশালী রাজা লক্ষণ সেনের দুঃশাসনের মাথা গুড়িয়ে দিলেন বঙ্গবিজয়ী বীর বখতিয়ার খিলজি। ১২০৩ মতান্তরে ১২০৪ সালে তাঁর বঙ্গজয়ের ফলে অবসান ঘটে আর্যশাসনের, ব্রাহ্মণ্যবাদী দুর্যোগের। এক ফোঁটা রক্তও এ জন্য ঝরেনি এ দেশে। সূচিত হয় নতুন দিন। রক্ত ও শ্রেণীগত বর্ণবাদের পরাজয় হলো। ঘোষিত হলো সাম্য ও মানবতার জয়বার্তা। ইসলামের একত্ববাদ, সেবাধর্মিতা, সকল মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কল্যাণকামিতা এদেশের মানুষকে বিশেষভাবে করে আকর্ষিত। ইসলামের প্রচারকরা মানবপ্রেম ও মানবমর্যাদার বাণী নিয়ে নতুন উদ্যমে ছড়িয়ে পড়লেন চারদিকে। এ বাণী বহুকাল ধরে শুনে আসছিলো এই মাটি, এই মানুষ। এ বাণী নিয়ে ৬৪৬ সালে এসেছিলেন মহান তাবেয়ি মুহাম্মদ মামুন ও মুহাম্মদ মোহাইমিন রহ.। ৮৭৪ সালে এসেছিলেন মহান আওলিয়া বায়েজিদ বোস্তামি, মাহমুদ মাহি সওয়ার, বদর শাহ রহ.। এ দেশের মানুষের কাছে ইসলামের বাণী তখন নতুন কিছু নয়। তারা শত শত বছর ধরে ইসলামের জীবন্ত রূপ দেখে আসছে প্রচারকদের জীবনে। উত্তম চরিত্রে মানুষ দেখতে পায় ইসলামকে। মাহাত্ম্য, মহৎ আচার-আচরণ ও মানবতার জন্য তাঁদের আত্মনিবেদনে জনগণ বুঝে নেয় ইসলামের কল্যাণী ভূমিকা।

তাদের হৃদয়ের দরোজা খুলে দেয় ইসলামের জন্য।

বখতিয়ার খিলজি যখন বিনাযুদ্ধে এ দেশ জয় করেন, তখন ইসলাম কোনো বহিরাগত ধর্ম নয় এখানে। শত শত বছর ধরে এই আলো, এই বায়ু, এই নদী ও বিহঙ্গের মতোই ইসলাম জনগণের আত্মীয় ও প্রতিবেশী। গণমনে ইসলাম আগ থেকেই বিজয়ের জমি তৈরি করে রেখেছিলো। বখতিয়ারের জয় তাই আকস্মিক কিছু ছিলো না। ইসলামের প্রচারক সুফি-দরবেশরা এই মাটি ও মানুষকে দিতেন ভালোবাসা। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে জানাতেন সম্মান। নিজেদের ভাষা পরিহার করে শিখতেন বাংলা ভাষা। কথা বলতেন বাংলায়। নিবাস গড়ে নিতেন এখানে। হয়ে যেতেন বাঙালি।

সাধক-দরবেশদের কর্মপন্থাই অবলম্বন করলেন মুসলিম শাসকগণ। তারা এই দেশ ও জনগণকে করে নিলেন আপন; দিলেন সেবা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। তাঁরা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত বাংলাকে করলেন একত্রিত। বঙ্গ, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট, বাঙ্গাল, প্রণ্ড্র, বরেন্দ্রী, রাঢ়, সুহ্ম, বজ্রভূমি, তাম্রলিপি, গৌড় প্রভৃতি জনপদকে প্রথমবারের মতো একত্রিত করে গড়ে তোলেন ঐক্যবদ্ধ বাংলা। শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা বাংলার সকল জনপদকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন গৌড় নামে। তাঁরা সে উদ্যোগ নেন 'অবজ্ঞা ও অনাদর'সহ এবং ব্যর্থ হন। কিন্তু কাজটি সম্পন্ন হয় মুসলিম শাসকদের হাতে। তাঁরাই ছিলেন বাংলা নামের দেশের রূপকার ও প্রতিষ্ঠাতা। ঐক্যবদ্ধ বাংলার স্থপতি। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সেই বাংলা থেকেই আজকের বাংলাদেশ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'বাঙালির ইতিহাস'-এ ঠিকই লিখেছেন–'গৌড় নামে বাংলার সমস্ত জনপদকে ঐক্যবদ্ধ করার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করেছিলেন, তাতে কাজ হলো না। যে বঙ্গ ছিলো আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিলো পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও আদরের–সেই বঙ্গ নামে শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হলো। আকবরের আমলে গোটা বাংলাদেশ সুবা বাংলা বলে পরিচিত হলো। ইংরেজের আমলে বাংলা নাম পূর্ণতর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করলো ।'

ধর্মীয় তত্ত্বের গদ্য-পদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য শূন্যপুরাণ হচ্ছে বাংলা

ভাষায় রচিত অন্যতম আদিগ্রন্থ। এর লেখক রামাই পণ্ডিত ছিলেন ত্রয়োদশ শতকের কবি, বাংলার আদিমতম উপাস্যদেবতা ধর্ম ঠাকুরের সেবায়েত। শূন্যপুরাণে তিনি মুসলিম বিজয়কে ইশ্বরের আশীর্বাদ বলে বর্ণনা করেন। তাঁর 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতায় বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কাহিনি এবং দেশবাসীর বিপন্ন অসহায়তার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়–'জাজপুর পুরবাদি/ সোল শত্য রঘু বেদী/ বেদী নয় কল্পএ নগুণ।/ দক্ষিণ্যা মাগিতে যায়/ জার ঘরে নাঞি পায়/ শাপ দিআ পোড়ায় ভুবন।/ মালদহে লাগে কর/ না চিনে আপন ঘর/ জালের নাহিক দিশ পাশ/ বলিষ্ঠ হইয়া বড়/ দশ বিশ হৈয়্যা জড়/ সদ্ধর্মীরে করএ বিনাশ।/ বেদে করি উচ্চারণ/ বেরয্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন/ দেখিয়া সভায় কম্পমান/ মনেত পাইআ মর্ম /সভে বোলে রাধ ধর্ম/ তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ/ এইরূপে দ্বিজগণ/ করে ছিষ্টি সংহরণ/ ই বড় হইল অবিচার।'

উড়িষ্যায় ষোল শ ঘর বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলো। বঙ্গদেশ ছিলো তাদের লাখেরাজ কলোনি। কানে পৈতা জড়িয়ে তারা এ দেশে দক্ষিণা আদায় করে ফিরতো। দাবিমতে মোটা দক্ষিণা দিতে কেউ অস্বীকার করলে ক্রুদ্ধ হয়ে তারা তার সর্বনাশ সাধন করতো। মালদহ কাছে ছিলো বলে সেখানে প্রতি ঘরে তারা কর নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলো। এ কর নির্ধারণের ব্যাপারে কোনোরূপ বাছ-বিচার তাদের ছিলো না। এ ছাড়া নানারূপ জাল-জুয়াচুরির তো অন্তই ছিলো না। এভাবে ব্রাহ্মণরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলো। দল বেঁধে তারা বাংলার বৌদ্ধ জনসাধারণকে বিনাশ করতে লাগলো। কথায় কথায় তারা বেদমন্ত্র আওড়াতো। যখন তখন তাদের মুখ দিয়ে যেন অভিশাপের আগুন ঝরতে থাকতো। তাদের রুদ্র রোষের ভয়ে দেশের জনসাধারণ সদা কম্পমান ছিলো। তারা অসহায়ের সহায় প্রভু নিরঞ্জনের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা জানাতো–'হে ধর্মঠাকুর, রক্ষা করো! তুমি ছাড়া কে আমাদের এ অমানুষিক অত্যাচার থেকে বাঁচাবে?'

নির্যাতিতের এই আর্তনাদ বিফলে গেলো না। 'বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম/ মনেত পাইআ মর্ম/ মায়াত হৈল অন্ধকার।' চিরকালের ধর্মঠাকুর বৈকুণ্ঠে বসে ব্রাহ্মণদের এ পাশবিক অত্যাচারে ব্যথিত হলেন। উৎপীড়িত ভক্তদের মর্মবিদারী প্রার্থনায় তিনি দয়ার্দ্র হলেন। অতএব তিনি 'ধর্ম হৈলা যবনরূপী/ মাথায়েত কালটুপি/ হাতে শোভে ত্রিকচ কামান/ চাপিয়া উত্তম হএ/ ত্রিভূবন

লাগে ভএ/ খোদাএ বলিয়া এক নাম।' মাথায় কালো টুপি পরে, হাতে তীর ধনুক নিয়ে উত্তম ঘোড়ায় চড়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে ত্রিভূবন কাঁপিয়ে মুসলমানরূপে ভক্তের মুক্তির জন্য আবির্ভূত হলেন। তিনি এসে বদলে দিলেন অত্যাচারীদের ধর্মরীতি ও নিয়ম-সংস্কৃতি। 'নিরঞ্জন নিরাকার/ হৈলা ভেস্ত অবতার/ মুখেত বলএ দম্বদার/ জতেক দেবতাগণ/ সভে হৈলা একমন/ আনন্দেতে পরিলা ইজার।' সাকার প্রভুদের বদলে নিরাকার নিরঞ্জন হলো। অবতাররা সব বেহেশতের বাসিন্দা হলো। যত দেবতা ছিলো, সবাই মহানন্দে মুসলমানদের ইজার পরিধান করলো। শুধু তাই নয়, 'ফকির হইলা জথ মুণি/ তেজিআ আপন ভেক/ নারদ হয়্যা শেক/ পুরন্দর হয়্যা মলানা/ চন্দ্র-সূর্য আদি দেবে/ পদাতিক হয়্যা সেবে/ সভে মিলে বাজাএ বাজনা।' যত মুণি-ঋষী, তাঁরা হলেন ফকির। নারদ বদলে দিলেন তাঁর বেশ-ভূষা। অবলম্বন করলেন শেক বা শায়খের পথ। পুরন্দর হলেন মাওলানা। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি দেব-দেবীরা দেবত্ব হারিয়ে পদাতিক সেজে বাজনা বাজিয়ে পীর-মাওলানাদের সেবা শুরু করলেন।

ব্রাহ্মণ্যশাসনের অবসানের আনন্দ রামাই পণ্ডিতের কণ্ঠে এবং বিজয়ী হয়ে মুসলিমদের প্রবেশকে তিনি ব্যক্ত করেছেন দেবতার প্রবেশ বলে। তাঁর ভাষায়–'জথেক দেবতাগণ/ সভে হয়্যা একমন/ প্রবেশ করিল জাজপুর।' বিজয়ী মুসলিম দেবতারা একই মন-মানসিকতা নিয়ে জাজপুরে প্রবেশ করলেন।

মুসলিম বিজয়ে বাঙালি কবির এত উচ্ছ্বাস! মুসলিমদের প্রতি এত শ্রদ্ধা! প্রামাণ্য ইতিহাস বলে, এ উচ্ছ্বাস ও শ্রদ্ধা কবির একার ছিলো না। এ ছিলো পুরো বাংলার উৎপীড়িত মানুষের মনের ভাষা।

মুসলিম বিজয় এ দেশের জনগণকে দিয়েছিলো শৃঙ্খল মুক্তির স্বাদ। মনুবাদের দুঃসহ বৈষম্য ও অধীনতা থেকে স্বাধিকারের আনন্দ। অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই ঠিকই ধরেছেন–'নব্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের যুগে সেকালের বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যে উৎপীড়িত হইয়াছিলো, এ দেশের সাহিত্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নিপীড়িত মানবতার নিকট ইসলাম আসিয়াছিলো বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ। সেই জন্য সেকালে অগণিত বৌদ্ধ ও হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিলো।' বিখ্যাত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ–'সঞ্জমী বা নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সহ্য করিত বলিয়া নিশ্চয় উত্যক্ত

ও বিব্রত বোধ করিতেছিলো। এমন সময় মুসলমান তুর্কিদের কাছ হইতে ইসলামী মানবতাবোধের এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় লাভ করিয়া তাহারা যে ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলো, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে তাহারা বংগে মুসলিম শাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছে।'

মুসলিম শাসকদের পাশে জনগণের দাঁড়িয়ে যাওয়ার সুফল পেতে বিলম্ব হয়নি। জনকল্যাণে শাসকরা হলেন নিবেদিত। সুলতানি আমলে বাংলা হয়ে ওঠে বাংলা। বাংলা হয়ে ওঠে বাঙালির। বাংলাদেশে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা হয় সুনিশ্চিত, আসে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক নিরাপত্তা, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে আসে ইতিবাচক পরিবেশ। সূতিকাগৃহেই মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায় বাংলা ভাষা। গড়ে তোলে নিজের মনোরম অবয়ব। বাঙালির আত্মশক্তির ঘটে স্ফূরণ, সাহিত্য সমৃদ্ধ হয় সৃষ্টিসম্ভারে। আত্মবিকাশের চাহিদা থেকে সৃষ্টি হয় ঐতিহ্য। একটি বিকাশমান রৌদ্রপুলক, একটি উচ্ছল জীবনবেগ, একটি মার্জিত ও প্রাণস্পন্দিত নবধারা জাতীয় চেতনার মর্মমূলে আনে গোপন গভীর উল্লাস। তার অভিপ্রকাশ ছিলো নতুন ভোরের মতো শিহরণচঞ্চল। এর কেন্দ্রে ছিলো সুলতানদের উদার আনুকূল্য, সহায়তা। প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্যের জন্ম মুসলিম যুগে।'

বাংলার আদিকোকিল চণ্ডীদাশ সমাদর পেলেন সুলতান সিকান্দার শাহের রাজসভায়। তাঁরই পুত্র গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ ছিলেন শাহ মুহাম্মদ সগিরের পৃষ্ঠপোষক। জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহের আদেশেই তো বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন কৃত্তিবাস। সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনার জন্য গুণরাজ খান উপাধী দেন মালাধর বসুকে। মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয় কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর, কাশীরাম দাসের মহাভারত ইত্যাদি অজর-অমর রচনা।

বাঙালি জীবনের যে সুখকর আত্মজ স্রোত, মুসলিম শাসনে তার তরুণ গতি বিচিত্র ছন্দে হয় প্রবাহিত। গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা মাছের চিত্র বাঙালি জীবনে তখন পায় নয়া বাস্তবতা। অর্থনীতিতে আসে সমৃদ্ধি, বাংলার মসলিনের জন্য ভিড় করতে থাকে বিশ্বের মহাজনরা। ইবনে বতুতা এসেছিলেন বাংলাদেশে।

তিনি বাংলাদেশে প্রবেশ করেন চট্টগ্রাম হয়ে, একে আখ্যায়িত করেন সোদকাওয়ান। গভীর ও উত্তাল সাগরে ৪৩ দিনের পথ পেরিয়ে তিনি